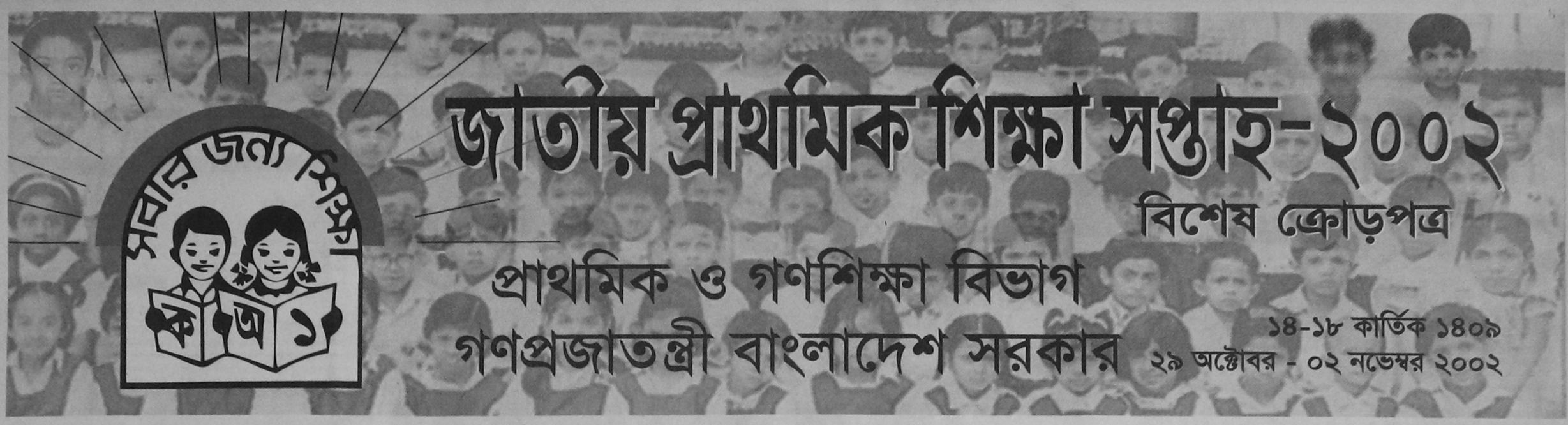

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ-২০০২

বিশেষ ক্রোড়পত্র

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪-১৮ কার্তিক ১৪০৯
২৯ অক্টোবর - ০২ নভেম্বর ২০০২

বিশেষ ক্রোড়পত্র | ১৪ই কার্তিক ১৪০৯ | মঙ্গলবার ২৯শে অক্টোবর ২০০২ | অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনা ঃ অনুপম পাবলিসিটি এজেন্সি

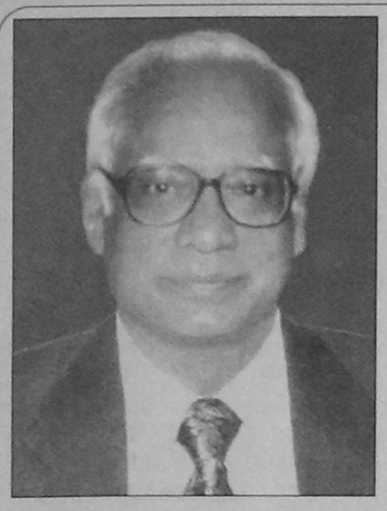

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
১৪ই কার্তিক ১৪০৯
২৯শে অক্টোবর ২০০২

বাণী

অন্যান্য বছরের মত এ বছরও 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

প্রাথমিক শিক্ষা হলো শিশুর মানসিক বিকাশের প্রথম সোপান। নিরক্ষরমুক্ত বাংলাদশ গড়তে প্রাথমিক শিক্ষা আন্দোলন আজ সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। এ আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আশা করি, দেশের ভবিষ্যত সুনাগরিক তৈরী করতে প্রতিটি সচেতন নাগরিক, অভিভাবক ও শিক্ষক এ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখবেন। এ সপ্তাহ পালন উপলক্ষে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বিদ্যালয়, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীসহ বিদ্যোৎসাহীদের স্বীকৃতি দেয়া হয়। এ স্বীকৃতি অন্যদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে অধিকতর যত্নশীল হতে অনুপ্রাণিত করে বলে আমি মনে করি।

আমি 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২' এর সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নঃ প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। বাংলাদেশে সকল নাগরিকের এই মৌলিক অধিকার দেশের সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। সত্তর দশকের শেষার্ধে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করার ক্ষেত্রে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তবে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদানের সূচনা হয় আশির দশকে। তখন থেকেই শিক্ষা খাতের প্রায় অর্ধেক বরাদ্দ প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্য দেয়া হয়। ১৯৮০ সালে সারাদেশব্যাপী প্রথম বারের মত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়।

সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি পালনে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপগুলো এ প্রসংগে স্মরণীয়, যেমন-১৯৯০ সালে মার্চ মাসে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত শিক্ষা বিষয়ক বিশ্ব ঘোষণায় স্বাক্ষর দান, ১৯৯০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিশু সম্মেলন এবং ১৯৯৩ সালে ডিসেম্বর মাসে নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ৯টি উচ্চ জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশের শীর্ষ সম্মেলনে সবার জন্য শিক্ষার দিল্লী ঘোষণায় স্বাক্ষর দান। এ ছাড়া ১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন পাশ করা হয়। এসব প্রেক্ষাপটে তদানীন্তন সরকার সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিভক্ত করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ নামে একটি পৃথক বিভাগ সৃষ্টি করে। গণতান্ত্রিক সরকার ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় আসার পর ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাসে পরীক্ষামূলকভাবে ৬৮ টি উপজেলায় এবং ১৯৯৩ সালে সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করে। বস্তুতপক্ষে এগুলো ছিল প্রাথমিক ও গণশিক্ষার উন্নয়নের প্রতি সরকারের দীপ্ত অঙ্গীকারের বহিঃপ্রকাশ।

জমতিয়েন-উত্তর প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও পরবর্তীতে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে জাতীয় কর্ম পরিকল্পনায় ২০০০ সাল নাগাদ জাতীয় লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে ছিলঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর ভর্তির হার ৯৫% এ উন্নীতকরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপ্তির হার ৭০% এ উন্নীতকরণ। সরকারের নিজস্ব তহবিল ও বৈদেশিক অর্থ সহায়তায় বাংলাদেশ শুধুমাত্র এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনই করেনি বরং কোন কোন ক্ষেত্রে এ লক্ষ্যমাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেছে। ২০০১ সালে বাংলাদেশে স্কুল ভর্তির হার ৯৭% ছাড়িয়ে গেছে। সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং যুগান্তকারী কিছু কর্মসূচী গ্রহণের ফলেই এই অর্জন সম্ভব হয়েছে। ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছরে দরিদ্র পরিবারকে তাদের সন্তানদেরকে বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য সহায়তা প্রদানকল্পে গ্রহণ করা হয়েছিল "শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী"। প্রথম বছরে প্রতিটি উপজেলার একটি ইউনিয়নে এ কার্যক্রম শুরু হলেও পরবর্তীতে ১২৫৫টি ইউনিয়নে তা সম্প্রসারণ করা হয়। বিগত সরকারের শাসনামলে খাদ্য সহায়তা বিতরণে ডিলারশীপ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে অনিয়ম ও জটিলতা সৃষ্টি হয়। এ কর্মসূচীকে আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ২০০২ সালের জুলাই থেকে খাদ্য শস্য (গম/চাল) প্রদানের পরিবর্তে আর্থিক সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এ লক্ষ্যে নতুন "উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পের" বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। দরিদ্র পরিবারের এক সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য মাসিক একশত টাকা এবং একাধিক সন্তানের জন্য একশত পঁচিশ টাকা দেয়া হচ্ছে। নির্বাচিত প্রত্যেক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চল্লিশ শতাংশ শিক্ষার্থী উপকৃত হবে। প্রতি বছর ৬৬৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী আর্থিক সহায়তা পাবে। এ কর্মসূচী প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে।

বিগত বছরগুলোতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ বেড়েছে। বর্তমানে দেশে শিক্ষার হার ৬৫.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু আশানুরূপভাবে বাড়েনি শিক্ষার মান। গুণগতমান অর্জনের জন্য অতিক্রম করতে হবে এখনও অনেকটা পথ। এ অবস্থার উন্নতিকল্পে গৃহীত পদপেগুলো হচ্ছে ঃ (ক) যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন এবং বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাপোকরণ বিতরণ, (খ) শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদারকরণ ও শিখন-শেখানো পদ্ধতি পরিমার্জন ও উন্নয়ন, (গ) বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও শিখন-শেখানো ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার স্থাপন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিকেন্দ্রীকরণ ও একাডেমিক সুপারভিশন প্রবর্তন, (ঘ) প্রশাসনিক পরিদর্শন জোরদার করে কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা আনয়ন, হোম ভিজিট প্রবর্তন, (ঙ) বিদ্যালয়ের ত্রৈমাসিক পারফরমেন্স রির্পোটিং প্রবর্তন ও পারফরমেন্সের ভিত্তিতে বিদ্যালয় শ্রেণী বিন্যাসকরণ, (চ) দুই শিফটের বিদ্যালয়গুলোকে এক শিফটে রূপান্তর করে পাঠদান-সময় বৃদ্ধি করা, (ছ) শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি করে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত কমিয়ে আনা, (জ) অংশগ্রহণমূলক, শিশুকেন্দ্রিক এবং আনন্দদায়ক পাঠদান পদ্ধতির প্রচলন (ঝ) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং অধীনস্ত প্রতিষ্ঠান সমূহের ব্যবস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে দেশী ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সুযোগ সৃষ্টি ও (ঞ) ব্যাপক সমাজ সম্পৃক্তকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

দেশে বর্তমানে ৩৭,৬৭১ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৯,৪২৮টি রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৯৭১টি আন-রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৫৭৬ টি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩৮৪৩টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা, ৩৫৭৪ টি উচ্চ মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ী মাদ্রাসা ব্যতীত ২৪৭৭টি কিন্ডারগার্টেন, ৪০৯৫ টি স্যাটেলাইট বিদ্যালয়, প্রায় ৩২৬৮টি কমিউনিটি বিদ্যালয় সহ মোট ৭৮,১২৬ টি প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য "শিশু কল্যাণ ট্রাষ্ট" পরিচালিত ৪৪টি বিদ্যালয়। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬-১০ বছর বয়সী প্রায় ১ লক্ষ ৭৭ হাজার শিশু পড়াশুনা করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রী ভর্তির অনুপাত ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির অনুপাত ছিল ৫৫:৪৫, ১৯৯৬ সালে এটি ছিল ৫২:৪৮ বর্তমানে এটি ৫১:৪৯ এ উন্নীত হয়েছে। অন্য দিকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত মহিলা শিক্ষকের অনুপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯১ সালে শিক্ষক-শিক্ষিকার অনুপাত ছিল ৭৯:২১ বর্তমানে এটি ৬২:৩৮ এ উন্নীত হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ৬০% মহিলা নিয়োগ সরকারের একটি বিঘোষিত নীতি।

এছাড়াও ভৌত সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ব্যাপক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। দেশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯০% বিদ্যালয়কে পূর্ণনির্মাণ বা সংস্কার করা হয়েছে। দেশের সব রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ২০০৩ সালের মধ্যে পুনর্নির্মাণ করা হবে। গ্রামীণ যে সকল বিদ্যালয়ে ৪০০ এর অধিক ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে সে সকল বিদ্যালয়ে দ্বিতল ভবন নির্মাণ বা কক্ষ সম্প্রসারণের কার্যক্রম চলছে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা লেট্রিন নির্মাণ করা হচ্ছে। আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে সব বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১০০০ এর অধিক বিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রমও বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ছোট ছোট শিশুদের দৌরগোড়ায় বিদ্যালয়ের সুযোগ সম্প্রসারণকল্পে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে স্যাটেলাইট বিদ্যালয়। বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এনজিওদেরকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। এ জন্য এনজিওদেরকে আর্থিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে। দেশের ছয়টি বিভাগীয় উপ-পরিচালকদের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে আলাদা বিভাগীয় কার্যালয়। ৬৪টি জেলার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে আলাদা নিজস্ব জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস। দেশের ৫৩টি সরকারী পিটিআই এর উন্নয়ন ও সংস্কারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বরগুনা জেলায় নির্মিত হচ্ছে আরো একটি নতুন পিটিআই। স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার। ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে ১৭৪ টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার।

ভৌত সুযোগসুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার ও পিটিআইগুলোতে সরবরাহ করা হয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও শিক্ষাপোকরণ। তদারকী ব্যবস্থা জোরদারকরণের লক্ষ্যে সকল সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে সরবরাহ করা হয়েছে মোটর সাইকেল।

মানসম্মত শিক্ষার জন্যে যা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হচ্ছে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক। এ লক্ষ্যে প্রথমত শিক্ষকের সকল শূণ্য পদ পূরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ২০০০টি প্রধান শিক্ষক ও ৮০০০টি সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের নিয়োগ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। নব নির্মিত কম্যুনিটি বিদ্যালয় ও কক্ষ সম্প্রসারিত বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় আরো ৮০০০টি শূণ্য পদে শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। পিটিআইগুলোতে ইনস্ট্রাক্টর নিয়োগের জটিলতার অবসান হয়েছে, সেখানে নতুন শিক্ষকের নিয়োগদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শুধু শিক্ষক নিয়োগদান নয় এদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে। বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণদানের কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে স্থানীয়ভাবে, স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে। চলছে ইংরেজী ভাষা শিক্ষাসহ বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ। পিটিআইগুলোতে এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)-তে চলছে বিভিন্ন সঞ্জিবনি প্রশিক্ষণ। আর একটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে, অর্থবহ সমাজ সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা। এ জন্য "বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির" সদস্য, "অভিভাক-শিক্ষক কমিটির" সদস্যদেরকে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ব্যাপক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সামাজিক আন্দোলনে রূপায়নের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, সকল সংসদ সদস্য, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে পত্র দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা ও ভিন্নপত্রে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছেন। আশা করা যায়, এতে প্রাথমিক শিক্ষার জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

আন্তর্জাতিক সকল প্রতিশ্রুতির বিষয়ে বাংলাদেশ অধিকতর সচেতন। ২০১৫ সাল নাগাদ সবার জন্য গুণগত মান সম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০০ এর ডাকার ঘোষণার প্রেক্ষিতে আমরা প্রনয়ন করছি নতুন জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা। অতীতের অর্জিত সাফল্যকে সুসংহত করা এবং নব নব ধ্যান ধারনার সমন্বয়ে এ শতকের উপযোগী, কার্যকরি, বিজ্ঞান ভিত্তিক ও শিশুকেন্দ্রিক একটি মানসম্মত শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন এর মূল লক্ষ। এরই পাশাপাশি ২০০৩-২০০৮ সালের জন্য আমরা প্রণয়ন করছি প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (২য় পর্যায়)। এ কর্মসূচীতে, শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত হ্রাস, শিক্ষক-ছাত্র সুবিধার সম্প্রসারণ, সর্বস্তরে ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উন্নয়ন, এসআইএস এর উন্নয়ন শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি, অপোকৃত কম সুবিধাভোগী সমাজের শিশুদের জন্য অব্যাহত আর্থিক সহায়তা কর্মসূচী, বিনামূল্যে পুস্তক, শেখন-শিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ, বিদ্যালয় ফিডিং কর্মসূচীর সম্প্রসারণ, অর্থবহ সমাজ সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে আরো দক্ষ ও সক্রিয় করা, বিদ্যালয় পর্যায়ে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, বিদ্যালয়ে সহ-পাঠ্যক্রম বিষয়ক পুস্তক সরবরাহ, পিটিআই, নেপ ও উপজেলা রিসোর্স সেন্টারগুলোর প্রশিণ প্রদান সুযোগ সুবিধার ব্যাপক সম্প্রসারণ, পরিদর্শন ও সুপারভিশন কার্যক্রম জোরদার এবং বিদ্যালয়গুলোতে ব্যাপক পাঠ্যসূচী বহির্ভূত কর্মকান্ডের ব্যবস্থা করা হবে।

আশা করা যায়, এ সব কার্যক্রম গ্রহণ এবং এর সফল বাস্তবায়নের ফলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষতার ক্ষেত্রে নবতর অধ্যায়ের সংযোজন ঘটবে।

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৪ই কার্তিক ১৪০৯
২৯শে অক্টোবর ২০০২

বাণী

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, বিদ্যালয় গমনোপযোগী ছেলেমেয়েদের স্কুলের আওতায় নিয়ে আসা এবং মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যেই এবার দেশে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালিত হচ্ছে জেনে আমি খুশি হয়েছি।

যুগ ও সমাজের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে প্রাথমিক শিক্ষাকে সকল স্তরে প্রসারিত করতে বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইতিমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত এবং গুণগত মানোন্নয়নে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের নগদ অর্থে উপবৃত্তি দেয়ার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হচ্ছে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষার ওপরও জোর দেয়া হচ্ছে। আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে মানবসম্পদ উন্নয়নের ভিত্ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার আহবান জানাই।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহে যে সকল কৃতি শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষার্থী পুরস্কার পেয়েছেন তাদের আমি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। শিক্ষা সপ্তাহে আমার আহবান, আসুন, সবার জন্য শিক্ষা কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করে দেশের প্রতিটি শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা লাভের অধিকারকে নিশ্চিত করি।

আমি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ- ২০০২-এর সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

খালেদা জিয়া

সচিব

সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৪ই কার্তিক ১৪০৯
২৯শে অক্টোবর ২০০২

বাণী

আমাদের দেশ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম একটি জনবহুল দেশ। মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে রূপান্তর করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দেশের সকল মানুষকে মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রয়াসে 'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২' এর আয়োজন করা হয়েছে।

সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে স্কুল গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তির হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়া হ্রাসকরণের লক্ষ্য অর্জিত হওয়ায় বর্তমানে মানসম্মত শিক্ষার বিষয়ে সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করণে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং শিক্ষকগণকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, অভিভাবকসহ সমাজের সর্বস্তরের জনগণের মাঝে শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি, বিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, পাঠদান কৌশলসহ শ্রেণীকক্ষ সজ্জিতকরণের মাধ্যমে বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করার কারণে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি জনগণের উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। দারিদ্রের কারণে কেউ যেন শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ থেকে বাদ না পড়ে সে জন্য দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তানদের উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা এ সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। শিক্ষা ও সংস্কৃতি অঙ্গনের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীরাও এ ধরণের স্বীকৃতি পেয়ে উৎসাহিত হবেন।

'জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২' আয়োজনে সম্পৃক্ত সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সপ্তাহের সাফল্য কামনা করছি।

অধ্যাপিকা (ডাঃ) তাহমিনা হোসেন

মহাপরিচালক

মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
১৪ই কার্তিক ১৪০৯
২৯শে অক্টোবর ২০০২

বাণী

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম"

বাংলাদেশ একটি জনবহুল, কৃষি নির্ভর ও উন্নয়নকামী দেশ। প্রাকৃতিক সম্পদ অত্যন্ত সীমিত। দেশের মানুষকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা গেলে স্বল্প সময়ের মধ্যে দেশের এই সীমিত সম্পদকে সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। শিক্ষা মানুষকে জনসম্পদে রূপান্তর করার একমাত্র উপায়। শিক্ষার মাধ্যমে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো তাদের জনগণকে বিভিন্ন পর্যায়ের জনসম্পদে রূপান্তর করে আজকে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। বাংলাদেশকেও এ পথে অগ্রসর হতে হবে। দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর। কারণ প্রাথমিক শিক্ষা সকল শিক্ষা স্তরের ভিত্তি। দেশের সকল মানুষকে যুগোপযোগী ন্যূনতম মৌলিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা না গেলে সারা দেশে জাতীয় উন্নয়নের স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাই বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। বর্তমান সরকারের এ প্রচেষ্টা আগামী বছরগুলোতেও অব্যাহত থাকবে।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিমাণগত দিক থেকে সাফল্য অর্জন করেছে। প্রাথমিক শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে এখন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিদ্যালয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের সমবেত প্রচেষ্টার ফলেই এই সাফল্য ও অগ্রগতি সাধন সম্ভব হয়েছে।

এ সপ্তাহ উদযাপনের মূল মর্ম হচ্ছে আত্মমূল্যায়ন এবং স্বীকৃতি। বিগত এক বছরের সাফল্যের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে যাদের মূল্যবান অবদানে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তাঁদের যথাযোগ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতি দেয়া।

যে সমস্ত শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, বিদ্যালয়, কাব এবং বৃত্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে তাঁদের সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২ এর সাফল্য কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

এ, এম, মোসাদ্দেকুল ইসলাম

মাননীয় উপদেষ্টা

মাননীয় উপদেষ্টা
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৪ই কার্তিক ১৪০৯
২৯শে অক্টোবর ২০০২

বাণী

জাতীয় উন্নয়নে সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদের বিকল্প নাই। মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষাই সকল শিক্ষা স্তরের বুনিয়াদ হিসাবে স্বীকৃত। প্রাথমিক শিক্ষার উপর যে সমস্ত দেশ যথাযথ গুরুত্ব দিয়েছে তাদের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানই সর্বপ্রথম সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯৩ সালে সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। ন্যূনতম সময়ের মধ্যে দেশকে সম্পূর্ণ নিরক্ষরমুক্ত করে সমৃদ্ধিশালী জাতি গঠনের দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে বর্তমান সরকার অগ্রসর হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ এবং এর গুণগতমান অর্জনের পথে কিছু সমস্যা থাকলেও বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি, শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার হার রোধ এবং সকল শিশুর বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতিসহ শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের ব্যাপক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সরকারের প্রচেষ্টার পাশাপাশি অভিভাবক ও বিদ্যানুরাগীসহ এ ব্যাপারে সমাজের সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা প্রয়োজন।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতিতে অবদান রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি সহ কাব শিশু ও বৃত্তি পরীক্ষায় অনন্য সাফল্য অর্জনকারীদের জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদান ও পুরস্কৃত করা হচ্ছে। আমি তাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই। আমি শিক্ষা সপ্তাহের সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম

সকল শিশুর জন্য মান সম্মত শিক্ষা নিশ্চিত হোক